



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 415 - 423

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাইকেল মধুসূদন' : একটি সমীক্ষা

শিবশক্তি শীট

গবেষক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : sibsakti.ecil@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Baglaranjan,
Mandakranta,
Christianity,
Navaranjan,
Rashtrabiplob,
Captive Lady,
Srimadhusudan,
Jatrapala,
Panchu Sen.

Abstract

In the twentieth century, despite being involved in writing plays for the Bangaranga stage, screenplays for films, and music, the one who took up the pen for Jatra and is world-famous as a successful Jatra writer is Baglaranjan alias Bidhayak Bhattacharya. As a stage director, he wrote 'Michael Madhusudan' and 'Rashtra Biplab' for the Nabaranjan opera; at the request of Panchu Sen, he wrote 'Bhakt Bhairav' based on the biography of Girish Chandra; he wrote 'Nati Binodini' for Ketki Dutta; He wrote many more Jatrapalas and gifted them to us. Among them, 'Michael Madhusudan' is one of the greatest Jatrapalas of that time. Based on the main events in the life of Madhusudan Dutta, Banful wrote 'Shri Madhusudan'. He probably drew inspiration from this book 'Srimadhusudan' and wrote 'Michael Madhusudan' based on his own experiences. He named this turn 'Michael Madhusudan' after the central character. The person at whose special request he wrote the 'Michael Madhusudan' Jatrapala for the Navranjan Opera is Jatrasamrat Swapan Kumar. Through the journey of holding Swapan Kumar's hand, Michael Madhusudan reached a wider audience beyond the educated and illiterate, and Swapan Kumar also reached the pinnacle of fame. And it was this 'Michael Madhusudan' that earned him the high honor of being a Jatrapala writer. However, Madhusudan had also worked with actors in theater, film, and Jatra even before that. However, the Bidhayak-Madhusudan-Swapankumar duo emerged as the best of all time. In other words, apart from Bidhayak, the Bangaranga stage can be said to be almost empty.

The story revolves around the main events of Madhusudan's life from the age of eighteen until his death. The story begins with the events two days after Madhusudan's conversion to Christianity. Rajnarayan Dutta is heartbroken that his only son has converted. Janhvi Devi fell ill from grief over her son. Marriage to Henrietta, separation from the family, father's second marriage, lack of money, malnutrition of the children, writing poetry, and drinking all made Michael delirious. After passing the bar, he became a barrister in the High Court. Vidyasagar came to visit the sick Madhusudan. The couple Madhusudan-Henrietta were on their deathbeds in Alipore Hospital. Henrietta died. Before his death, Madhusudan gifted a poem to Devaki and asked her to publish it. The famous poem is— Stand by the wayside, if you were born in Bengal! A moment of great joy!... With the impeccable

writing skills of Bidhayak Bhattacharya and the unique acting style of Swapan Kumar, this turn became the best Jatra turn of all time.

Discussion

১

বিশ্বশতকে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের জন্য নাটক, চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য ও সংগীত রচনাকর্মে যুক্ত থেকেও কলম ধরে যিনি সফল যাত্রাপালাকার হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন; তিনি বগলারঙ্গন ওরফে বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-৮৬)। তিনি মূলত নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক। যদি সাহিত্যের বিবিধ শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে *মেঘমুর্জি*, *মাটির ঘর*, *ক্ষুধা*, *তেরশো-পঞ্চাশ*, *তাহার নামটি রঞ্জনা*, *সরীসৃপ* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নাটক রচনার পাশাপাশি নাট্যপরিচালক হিসেবে তাঁর দক্ষতা প্রশংসার দাবি রাখে। *খবর বলছি*, *সেই তিমিরে*, *দ্বিধার* মতো নাটকগুলি তিনি পরিচালনা করেছেন। আবার, চন্দ্রমোহন (*খবর বলছি*), গগন গড়াই (*ক্ষুধা*), শ্রীনাথ (*মন্দাক্রান্ত*), মামাবাবুর (*এন্টনি কবিয়াল*) মতো চরিত্রে তাঁর অভিনয় দক্ষতা প্রমাণ করে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তিনি কতখানি সফল।

তাঁর রচিত নাটকগুলির বেশিরভাগ *রঙমহল* থিয়েটারে অভিনীত হয়। এছাড়া *মিনার্ভা*, *শ্রীরঙ্গম*, *বিশ্বরূপা* প্রভৃতি থিয়েটারের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে পেশাদার রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংযোগের পর থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর জীবন দীর্ঘ ঘটনাবল্ধ। সমস্যা ও সংকটকালীন মুহূর্তেও তাঁর কলম থেমে থাকেনি। নিরুদ্বেগ ও ঠান্ডা মাথায় তিনি লিখে গেছেন সাহিত্যের সব দিকপালদের সঙ্গে সমান্তরালভাবে। সবাই তাঁর লেখার সুখ্যাতি এবং প্রশংসা বাক্য প্রয়োগ করলেও নিরুদ্বেগ এই মানুষটি নীরবে নিভূতে কর্মসাধনা করে গেছেন। তাঁর নাটক বিখ্যাত সব অভিনেতা অভিনেত্রীদের দ্বারা মঞ্চস্থ হলে, আলোড়ন তুললেও তিনি কিন্তু ভাবতেন পরের নাটক কি হতে পারে! আরো কতখানি দর্শকমুখী করে তোলা যায়। যে কারণে তার কাছে নাটক লেখার জন্য নাট্যদলের লাইন লেগেই থাকত। তাঁর কাছে নাটক বা পালা লেখার জন্য আসতেন বিখ্যাত সব মানুষজন। লেখার সুবাদে অজস্র অভিজ্ঞতা ও মজার সব কাহিনির সাক্ষী থেকেছেন তিনি। বিশ্রামের অবকাশ পাননি বললেই চলে।

২

যাত্রা জগতে তখন নাম করেছেন নটসম্রাট স্বপনকুমার। ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ বা পঞ্চ সেনের পরবর্তী অভিনেতা হিসেবে তার খ্যাতি শিখর স্পর্শ করেছে। নিজে নির্দেশক হবার পাঁচ বছর পর ১৯৬৭ সালে তিনি ঠিক করলেন মাইকেল মধুসূদন করবেন। স্বপন কুমারের মনে হল পুরাণ কাহিনি নয় ইতিহাস নয় বাইরের আদর্শ চরিত্রকে তুলে ধরবেন দর্শকসম্মুখে। তাঁর খ্যাতি তখন যাত্রার মাঠে শীর্ষে বিরাজ করছে। তবু যে দলই শুনছে তিনি মাইকেল-কে নিয়ে পালা করবেন, তারাই সরে যাচ্ছে। তিনিও বদ্ধপরিকর। *নবরঙ্গন অপেরা* একমাত্র দল যাঁরা রাজি হলেন। দলের কর্ণধার জীবনকৃষ্ণ দাস। কিন্তু দলের ম্যানেজার শম্ভু ঘোষই প্রধান। সেইমতো নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের কাছে এসে মধুসূদনের জীবনীকে কেন্দ্র করে একটি পালা লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। বিধায়ক প্রথমটা রাজি হলেন না। তবে শেষমেষ স্বপন কুমারের একান্ত অনুরোধ কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। লিখে দিলেন যাত্রাপালা *মাইকেল মধুসূদন*। আসলে রচয়িতাকে ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে স্বপনকুমারের কিছুটা সুবিধা হয়েছিল -

“স্বপনকুমার ৬৪ সাল থেকে থাকতেন টালায় ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে। এ পাড়ায় তখন বিরাজ করছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। অদূরে তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়। যাত্রার ছুটির সময় স্বপন এঁদের কাছে গিয়ে আড্ডা দিতেন। ... বিধায়ক ভট্টাচার্যও স্বপনবাবুর প্রতিবেশীই ছিলেন। বগলাদা বলে ডাকতেন স্বপন। বিধায়ককেই ধরলেন মাইকেল-কে নিয়ে পালা লেখার জন্য। ওই আর এক প্রতিভা। কিন্তু উপচে পড়া এধার ওধার বড়ো ছড়ানো। তাঁর পেছনে লেগে না থাকলে তাঁকে দিয়ে নাটক লেখানো সে সময়ে বড়ো কঠিন কাজ। প্রথম দৃশ্য শুনেই স্বপনবাবুর বিশ্বাস প্রোথিত। এরপর ইতিহাস।”

বিধায়কবাবু যাত্রার জন্য কলম ধরে তিনি কয়েকটি যাত্রাপালা আমাদের উপহার দিলেন। লিখলেন একের পর এক *নবরঞ্জন অপেরা*-র জন্য *মাইকেল মধুসূদন*, *রাষ্ট্রবিপ্লব*, পঞ্চ সেনের অনুরোধে গিরিশচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে লিখলেন *ভক্তভৈরব*, কেতকী দত্তের জন্য লিখলেন *নটী বিনোদিনী* প্রভৃতি। তাঁর অন্যান্য যাত্রাপালার মতো *মাইকেল মধুসূদন*-ও শ্রেষ্ঠ পালা হিসেবে বিবেচিত হল। মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) জীবনের মূল ঘটনাকে অবলম্বন করে বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) লিখলেন *শ্রীমধুসূদন* (১৯৩৯)। বিধায়ক ভট্টাচার্য সম্ভবত এই *শ্রীমধুসূদন* গ্রন্থ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে ও নিজ অভিজ্ঞতা দিয়ে লিখেছিলেন *মাইকেল মধুসূদন*। কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামে এই পালার নাম রাখলেন *মাইকেল মধুসূদন* আর দেবকীকে নায়িকারূপে চিত্রিত করলেন। যাত্রাপালাটি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে *নবরঞ্জন অপেরা* কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। নামভূমিকায় স্বপনকুমার [মুখোপাধ্যায়] বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

“বলা যেতে পারে এটিই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিত্র চিত্রণ। তিনি ‘মাইকেল’ চরিত্রাভিনয়ের জন্য বহুস্থান থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেন।”^২

মাইকেল মধুসূদনের জীবন ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে অনেকেই নাটক রচনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মহেন্দ্র গুপ্ত মাইকেল মধুসূদনের শেষ দুই বছরের জীবনের ঘটনাকে অবলম্বনে লিখলেন *মাইকেল* নাটক। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন *রঙমহল* থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয় এই নাটক। নানা চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে মধুসূদনের অতীত জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকে দেবকী চরিত্র অনুপস্থিত। এই নাটকের পরিচালনা ও নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন প্রখ্যাত অভিনেতা অহিন্দ্র চৌধুরী। শিশির কুমার ভাদুড়ীর (১৮৮৯-১৯৫৯) অনুপ্রেরণায় নিতাই ভট্টাচার্য মধুসূদনের জীবনকাহিনীনির্ভর *মাইকেল মধুসূদন* (১৯৪২) রচনা করেন। এই নাটকটি শিশির কুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় ১৯৪২ সালে *শ্রীরঙ্গম* রঙ্গমঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। মুখ্যচরিত্র মধুসূদন-এর ভূমিকায় পরিচালক স্বয়ং মঞ্চে অবতীর্ণ হন। মধুসূদনের জীবন অবলম্বনে লেখা ‘দাঁড়াও পথিকবর’-ও উৎপল দত্তের অমর সৃষ্টি। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ২২ নভেম্বর *য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট*-এ প্রথম অভিনয় হয়। নাটকে মাইকেল মধুসূদনের সমগ্র জীবনের পরিবর্তে অন্তর্জীবন-কাহিনি রূপায়িত করেছেন। বলা যায়, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মধুসূদনের নাটক অভিনয় থেকে শুরু করে তাঁর ভাসাই শহরে অবস্থান পর্যন্ত কাহিনি বিধৃত হয়েছে। শুধু রঙ্গমঞ্চে নয়, সিনেমার পর্দায়ও মাইকেল মধুসূদন বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরিচালক মধু বসুর *মাইকেল মধুসূদন* একটি শ্রেষ্ঠ সিনেমার উদাহরণ। ১৯৫০-এ এটি প্রথম মুক্তি পায়। মাইকেল চরিত্রে অভিনয় করেন উৎপল দত্ত।

৩

পাঁচ অঙ্কে রচিত নাটকটির প্রথম অঙ্কে ৪টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে ৪টি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে ৩টি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে ৩টি দৃশ্য, পঞ্চম অঙ্কে ২টি দৃশ্য বর্তমান। পঞ্চম অঙ্কের ২য় দৃশ্যের মধ্যে একটি দৃশ্যান্তর আছে। নাটকটির কাহিনিবিন্যাস অনেকটা ঠিক এরকম— সম্পূর্ণ কাহিনি বৃত্তে আছে, মধুসূদনের শেষ আঠার বৎসর বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের মূল ঘটনা। মধুসূদনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের দুদিন পরের ঘটনা দিয়ে কাহিনি শুরু হয়েছে।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আছে, একমাত্র পুত্র ধর্মান্তরিত হওয়ায় জাত্যাভিমাত্রী রাজনারায়ণ অত্যন্ত মর্মান্বিত হয়ে স্ত্রী জাহ্নবীকে বললেন, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোরাসাহেবের প্ররোচনায় মধুসূদনের মতো পিতৃমাতৃভক্ত সন্তান খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। সেজন্য তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। মধুসূদনের মামা হরিহর মিত্রও রাজনারায়ণকে পুত্রত্যাগ করার উপদেশ দিলেন। রাজনারায়ণ সে প্রস্তাবে রাজি না হয়ে বললেন, সমাজকে তিনি অর্থ দিয়ে কিনে নেবেন। ফলে উভয়ের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হলে ক্রুদ্ধ হরিহর তাকে নির্বংশ হওয়ার অভিশাপ দিয়ে বিদায় নিলেন। হরিহরের শেষ উক্তি রাজনারায়ণকে বিচলিত করে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আছে, ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত মধুসূদন এলেন। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন কথা দিয়েছেন, মধু খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর কন্যা দেবকীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেবেন ও ইংল্যান্ড পাঠাবেন। তিনি ভাবছেন, কবে সেই স্বপ্নের দেশ ইংল্যান্ড যাবেন। এদিকে তাঁর বন্ধুরা মধুসূদনকে বাবা-মার সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু মধুসূদন কোন্ মুখে পিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন, সে কথা ভেবে তিনি সেখানে যেতে ভরসা পাচ্ছেন না। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আছে, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন তাঁর একমাত্র কন্যা দেবকীকে

মধুসূদনের হাতে অর্পণ করার আগে মদত্যাগ করার পরামর্শ দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে বলেন। মধুসূদন বললেন, মদ তাঁর জীবনের অনুপ্রেরণা। তিনি মদ ত্যাগ করতে পারবেন না ত্রুষ্ক ক্ষুষ্ক কৃষ্ণমোহন দেবকীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্মতি আর দিলেন না। সব কথা শুনে দেবকী বললেন, মাইকেল তাঁর গুরু, তিনি শিষ্য। মাইকেল তাঁর প্রথম প্রেম, তাঁর ইহকাল-পরকার, তাঁর সর্বস্ব। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে আছে, মধুসূদন অসুস্থ মা জাহ্নবী দেবীকে দেখতে এলেন। মা পুত্রকে কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন। জাহ্নবী পুত্রকে খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে পূর্ব ধর্মে ফিরে আসার অনুরোধ করলেন এবং তাঁর নির্বাচিত পাত্রীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার অনুরোধ করলেন। মধুসূদন রাজী হলেন না। তিনি বললেন, তিনি হিন্দুধর্মের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ধর্মত্যাগ করেননি। তাঁর আরাধ্য কবি খ্রিষ্টান বলে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। সেই সময় রাজনারায়ণ এলেন। মধুসূদন তাঁর কাছে বিলেত যাওয়ার জন্য পাঁচহাজার টাকা চাইলেন ও বিলেত পৌঁছে গেলে আরো পাঁচ হাজার টাকা যেন পাঠান সেই অনুরোধ করলেন। রাজনারায়ণ রূঢ়ভাষায় সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি এও বললেন, তিনি তাঁকে ত্যাজ্য পুত্র করেছেন। মধুসূদন উত্তরে বললেন, যে জাতি আর ধর্ম নিয়ে রাজনারায়ণ গর্ববোধ করেছেন, সেই জাতিভেদ ভবিষ্যতে থাকবে না। শুধু তাই নয়, এমন একদিন আসবে যেদিন মুগ্ধী রাজনারায়ণ দত্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের পিতারূপে সমাজে পরিচিত হবেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আছে, অর্থাভাবে মধুসূদনের বিলেত যাওয়া হল না। সাহেবরাও সে ব্যাপারে তাঁকে কোনো সাহায্য করলেন না। অগত্যা তিনি মাদ্রাজ চলে গেলেন এবং সেখানে বর্তমানে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। গৌরদাস বসাককে লেখা একটি পত্রে মধুসূদন তাঁর যে প্রাত্যহিক জীবনচর্যার বিবরণ দিয়েছেন তাতে জানা যায়, তিনি শিক্ষকতা করা ব্যতীত হিব্রু, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত, ল্যাটিন, ইংরাজি ও বাংলা ভাষা অভ্যাস করছেন। ইতিমধ্যে *ক্যাপিটিভ লেডি* লিখে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেও আর্থিক সুবিধা বিশেষ কিছু হয়নি। গৌরদাস আরো জানালেন, মধুসূদন মাদ্রাজে গিয়ে রেবেকা ম্যাষ্টাভিস নামে এক স্কচ নীল দুহিতাকে বিবাহ করেন কিন্তু কিছুদিন পর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে এরপর তিনি হেনরিয়েটা নামে এক ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করেন। বর্তমানে তাঁরা সুখে সংসার করছেন। এদিকে বন্ধুবান্ধব কৃষ্ণমোহন মিলে মধুসূদনকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। তারজন্য কাজেরও বন্দোবস্ত করছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আছে, পুত্রশোকে রাজনারায়ণ দিনরাত মদ্যপান করে চলেছেন। তাঁর কাছে ডাকযোগে মধুসূদন তাঁর লেখা দু-খানি বই পাঠিয়ে দিয়েছেন। পুত্রের কৃতিত্বে তাঁর গর্বের সীমা নেই। খুশি হয়ে রাজনারায়ণ এক হাজার টাকা প্রেরণ করলে মধুসূদন প্রত্যাখ্যান করে। পিতার কষ্ট হলেও জাহ্নবী ঈশ্বরের কাছে পুত্রের মঙ্গল কামনা করে চলেছেন। তারপর তিনি রাজনারায়ণকে পুত্রলাভার্থে পুনরায় বিবাহ করতে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আছে, মাদ্রাজে মা'র সম্পর্কে দুঃস্বপ্ন দেখে মধুসূদনের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি হেনরিয়েটাকে ডেকে বললেন, তাঁকে যেন তক্ষুনি ব্র্যান্ডি দেওয়া হয়, কারণ তিনি লেখার মধ্যে ডুবে থেকে বাস্তবকে ভুলতে চান। ইতিমধ্যে কৃষ্ণমোহন ও দেবকী এলেন। তাঁদের দেখে মধুসূদন যুগপৎ আশ্চর্য ও আনন্দিত হলেন। তাঁরা জানালেন, বেখুন সাহেব তাঁকে চিঠি দিয়েছেন বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনা করার জন্য। সে-কথা শুনে হেনরিয়েটা তাঁকে বাংলাভাষায় কাব্য সৃষ্টি করার জন্য উৎসাহ দিলেন। দেবকী গৌরদাসের দেওয়া দুশো টাকা ও রামায়ণ মহাভারত তাঁর হাতে তুলে দিলেন। কলকাতায় যে তাঁর বাসস্থান ও চাকুরির ব্যবস্থা হয়েছে জেনে তিনি স্থির করলেন, কলকাতায় ফিরে যাবেন। হঠাৎ তিনি গৌরপ্রদত্ত খাম খুলে চিঠি পড়তে শুরু করলেন। চিঠি পড়ে জানতে পারলেন, মা'র খুব অসুখ করেছে। সে সংবাদে মাইকেল কেমন উদ্ভ্রান্তের মতো হয়ে যান। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে আছে, রাজনারায়ণ পুনরায় বিবাহ করেছেন। কিন্তু মনে তাঁর শাস্তি নেই। তিনি পুত্রের কথা স্মরণ করে মনের জ্বালা মেটাতে মদের আশ্রয় নেন। জাহ্নবী পুত্রশোকে উন্মাদপ্রায় হয়ে গেছেন। মধুসূদন মাকে দেখতে এলেন। ঠিক কিছুক্ষণ পূর্বে জাহ্নবী দেবী দোতলা থেকে গড়িয়ে পড়ে প্রাণ হারান। মধুসূদন মাকে দেখার জন্য অগ্রসর হতেই রাজনারায়ণ বাধা দিলেন। তিনি বললেন, মধুসূদন খ্রিষ্টান বলে জাহ্নবীকে স্পর্শ করার অধিকার নেই, শুধু তাই নয়, তিনি স্পর্শ করলে তাঁর মা স্বর্গে যেতে পারবেন না। জল ভরা চোখে মধুসূদন বেরিয়ে গেলেন।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আছে, মধুসূদন আদালতে দোষাধীর কাজ নিয়ে অর্থ উপার্জন করছেন। কিন্তু অমিতব্যয়িতার জন্য তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এরমধ্যে তিনি কাব্য রচনা করে চলেছেন। গৌর বসাক এসে জানালেন,

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যটি তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়েছেন। মধুসূদন বললেন, তিনি মেঘনাদবধ কাব্য নামে একটি মহাকাব্য খুব শীঘ্র জমা করবেন। কথাপ্রসঙ্গে মাইকেল বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রত্নাবলী অভিনয় দেখার নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন বলে জানান। মাইকেল সেখানে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইতিমধ্যে জানা গেল, অর্থের অভাবে হেনরিয়েটা তাঁদের বেয়ারাকে বিদায় করেছেন। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আছে, মধুসূদন তাঁর বন্ধুদের বললেন, তিনি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বস্তু গ্রহণ করে বাংলা নাটক রচনা করবেন, তাঁর প্রথম নাটক হবে 'শর্মিষ্ঠা' এবং সেই নাটক সাতদিনে সমাপ্ত করবেন। এত অল্প সময়ে তিনি নাটক লিখতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে ভূদেব, রাজনারায়ণ সংশয় প্রকাশ করলেন। কিন্তু গৌর বললেন, মধুসূদন যে নাটক রচনায় রাজি হয়েছেন তার মধ্যে কোনো শুভ ইঙ্গিত রয়েছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাইকপাড়ার রাজভ্রাতাঘরের পক্ষ থেকে পাঁচশো টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন ও অগ্রিম আড়াইশো টাকা মধুসূদনকে দিলেন। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আছে, মাইকেল অর্থের সন্ধানে গেছেন। ঘরে খাবার নেই। সন্তানরা অভুক্ত। হেনরিয়েটা মাইকেলের জন্য অপেক্ষা করছেন। সে সময় দেবকী এলেন। তিনি তাঁদের দুরাবস্থার কথা শুনে হেনরিয়েটাকে একশত টাকা দিলেন। দেবকী চলে গেলে মধুসূদন মত্তাবস্থায় এসে বললেন, তিনি দুটি প্রহসন লিখে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁকে আড়াইশো টাকা দিয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি হেনরিয়েটার জন্য একট গাউন কিনেছেন এবং বারে দুকে খাবার ও মদ্যপান করে প্রায় সব অর্থ নিঃশেষ করে মাত্র তিনটাকা ও কিছু পয়সা ফেরৎ এনেছেন। হেনরিয়েটা সে কথায় চিন্তিত হন। তাঁদের কিছু খাওয়া হয়নি শুনে মধুসূদন লজ্জিত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দিলেন। হেনরিয়েটা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, এক বাঞ্চবীর কাছ থেকে কিছু অর্থ নিয়ে তিনি খাবারের বন্দোবস্ত করেছেন। কিছুক্ষণ পর পাওনাদার এসে অর্থ চাইলে কোনোক্রমে বুঝিয়ে তাঁদের ফেরৎ পাঠানো হল। ঠিক সে সময় বাড়িওয়ালা এলেন। দীর্ঘদিন বাড়িভাড়া বাকি থাকায় লোকজন নিয়ে তিনি মধুসূদনকে সপরিবারে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে এসেছেন। ঠিক সেইক্ষণে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হল। তিনি আটশো টাকার চেক লিখে বাড়িওয়ালাকে দিলেন। বিস্মিত স্বামী স্ত্রীকে বিদ্যাসাগর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, গৌরদাস তাঁকে মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য-এর পাণ্ডুলিপি পড়তে দিয়েছেন কিন্তু সে কাব্যের ছন্দ ধরতে না পারায় মধুসূদনের মুখে কাব্যটি শুনবেন বলে তিনি তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন। মুগ্ধ অভিভূত মধুসূদন বিদ্যাসাগরের মহানুভবতায় তাঁকে তাঁর হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আছে মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটক, ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও মেঘনাদবধ কাব্য একই সময় একসঙ্গে রচনা করে চলেছেন। তিনি মুখে বলছেন, তিনজন পণ্ডিত তা লিখে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে যাবেন বলে স্থির করেছেন। একদিন সকালে দেবকী এলেন। মাইকেলের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন। মধুসূদনের অনুরোধে দেবকী পদ্মাবতী নাটক থেকে একটি গান গেয়ে শোনালেন। মুগ্ধ মাইকেল আনন্দে আবেগে দেবকীকে জড়িয়ে ধরলেন এবং উচ্ছ্বাসভরে জিজ্ঞাসা করলেন, দেবকী বর্তমানে তাঁকে ভালবাসেন কিনা। দেবকী স্বীকার করলেন পূর্বের মতো বর্তমানেও ভালবাসেন। আনন্দে মাইকেল হেনরিয়েটাকে সে কথা বলতে গেলে দেবকী লজ্জায় সে স্থান ত্যাগ করে। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আছে গৌরদাস এসে বিদ্যাসাগরকে জানান, লন্ডনে মাইকেল ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার কিছুদিন পরেই কলকাতায় অবস্থিত হেনরিয়েটা পুত্রকন্যাসহ অর্থভাবে দিনযাপন করছিলেন। শেষপর্যন্ত হেনরিয়েটা স্বামীর কাছে যাওয়া মনস্থির করায় গৌরদাস তাঁদের সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর সব শুনে গৌরদাসের সুবুদ্ধির প্রশংসা করেন। চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আছে হেনরিয়েটা ও পুত্রকন্যাকে নিয়ে সংসার চালাতে না পারায় মাইকেল লন্ডন ত্যাগ করে ফ্রান্সে চলে এসেছেন। অর্থের অভাবে ব্যারিস্টারি পড়া অসমাপ্ত রইল। বর্তমানে তিনি ভার্সাই শহরে আছেন। চারিদিকে পাওনাদার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জেলে যাওয়ার ভয়ে মাইকেল সবসময় এটঙ্ক হয়ে আছেন। বন্ধু মনোমোহন এলে তাঁর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে সেদিনের খাবারের বন্দোবস্ত করলেন। মাইকেল মনোমোহনকে জানান, তিনি সেই অবস্থার মধ্যে ফরাসী জার্মানী ও ইটালী ভাষা শিখে ফেলেছেন, পর্তুগীজ শিখছেন এবং বিদেশী সনেটের অনুসরণে বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতাবলী লিখেছেন। তাঁদের কথোপকথনের মধ্যে বাইরে থেকে বেল বাজল। পাওনাদার এসেছেন ভেবে মধুসূদন প্রথমে দরজা খুলতে চাইলেন না। তখন মনোমোহন দরজা খুলে দেখলেন পোস্টম্যান এসেছে। মধুসূদনকে ডেকে দিলেন। মধুসূদন ফিরে এসে জানান, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক বিরাট অঙ্কের ড্রাইফ্ট

পাঠিয়েছেন। সেই অর্থে তিনি নূতন করে বাঁচবেন, ব্যারিষ্টারি পড়তে যাবেন, এইভাবে এক অপরিসীম আনন্দে মধুসূদন চিৎকার করে উঠলেন।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আছে মাইকেল ব্যারিষ্টারি পাশ করে অতি অল্প সময়ে হাইকোর্টে পশার জমিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ঋণ তাঁকে ছাড়ল না। একদিন কোর্টে তাঁর রক্তবমি হল। তারপর থেকে মাঝে মাঝে কাশি ও রক্তবমি হচ্ছে। এসব সত্ত্বেও তিনি মদ্যপান বন্ধ করেননি। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য তাঁর বন্ধুরা উদ্বিগ্ন। হেনরিয়েটাও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খবর পেয়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে বিদ্যাসাগর মাইকেলকে দেখতে এলেন। আলিপুর হাসপাতালে মধুসূদন ও হেনরিয়েটা মৃত্যুশয্যা। অসুস্থতার সংবাদে বন্ধুবান্ধব দেখা করতে এসেছেন। কিছুক্ষণ পর হেনরিয়েটার মৃত্যু হল। মধুসূদনও ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি কবিতা দেবকীকে উপহার দিয়ে বললেন, তিনি যেন সেই কবিতা প্রকাশের ভার নেন। সেই বিখ্যাত কবিতাটি হল – “দাঁড়াও পথিকবর, জন্মা যদি তব/ বঙ্গ...।” পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের মধ্যে একটি দৃশ্যান্তর আছে। পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে আছে মধুসূদনের মৃত্যু হয়েছে। তার সমাধি স্থাপিত হয়েছে। সেখানে মাইকেলের বিখ্যাত কবিতাটি রয়েছে— দাঁড়াও পথিকবর...।

8

পালাধর্মী এই নাটকটির কাহিনিবিন্যাস থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটি যাত্রাপালার জন্য রচিত হলেও এর অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাজন ঠিক নাটকের মতো। যদিও স্বপনকুমারের ইচ্ছে তাই ছিল। প্রয়োজনে তিনি নিজে সংলাপ প্রয়োজনমাত্তিক বসিয়ে নেবেন বলে জানিয়েছিলেন রচয়িতাকে। তাই যদি ধরে নিই, তাহলেও নাট্যক্রিয়ার বিভাগ যথার্থ হয়েছে বলতেই হবে। যদি আমরা John Howard Lawson-এর তত্ত্বানুসারে দেখি তাহলে এই নাটককে অনায়াসে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। পিতৃমাতৃভক্ত মধুসূদনের খ্রিষ্টধর্মগ্রহণের সংবাদে রাজনারায়ণ দত্ত'র মানসিক অস্থিরতার মধ্যদিয়ে নাট্যক্রিয়ার প্রথম পর্যায় (exposition) প্রকাশিত হয়। খ্রিষ্টান হওয়ার পর বাঙালি পোষাকে মধুসূদনের কলেজে যাওয়া, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে মাইকেলের সংশয় প্রকাশের মধ্যদিয়ে নাট্যক্রিয়ার অগ্রগতি (rising action) ঘটেছে। তৃতীয় পর্যায়ে সংঘাতের (clash) সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণমোহন কর্তৃক মধুসূদনের হাতে কন্যা দেবকীকে সমর্পণে অস্বীকৃতি হওয়া; বিলেত গমনের জন্য পিতার কাছে প্রতিশ্রুত অর্থ না পাওয়া বরং তাজপুত্র বলে বিবেচিত হওয়া; মাতা জাহ্নবীর মৃতদেহ দেখতে না পাওয়া; অমিতব্যয়ী হওয়ায় আর্থিক দুরবস্থা পড়ায় তাঁকে মাঝে মাঝে মানসিক সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে হেনরিয়েটা ও মাইকেলের অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে মৃত্যুর দ্বারা নাট্যক্রিয়ার চূড়ান্তরূপ (climax) সাধিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে।

মাইকেল মধুসূদন লোকনাট্য হওয়ায় সংলাপের ক্ষেত্রে আবেগময়তা লক্ষ্য করা যায়। এ পালার সংলাপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পঞ্চম নাটকের সঙ্গে পালা নাটকের যে সংগীতময়তা গত পার্থক্য থাকে, তা এখানে বজায় আছে। এই পালার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দক্ষতাও সাড়া ফেলেছিল। বিশেষত মাইকেল চরিত্রে স্বপনকুমারের অভিনয়। ভাবা যায় ১৯৬৭ সালে যাত্রায় মাইকেলের মুখে সংলাপ -

“This is a fool's paradise - এই পৃথিবীটা হচ্ছে মূর্খের স্বর্গ। যাদের ভাত কাপড়ের অভাব নেই, টাকা-কড়ির অভাব নেই তারা এক একটা মনগড়া দেবতা তৈরি করে কেউ নাম দিয়েছে কেউ, কেউ বিষ্ণু, কেউ কালী, কেউ দুর্গা। আর যাদের তা নেই তারা মানুষকে দেবতা বানিয়ে নাম দিয়েছে ক্রাইস্ট। ধর্মের নেশায় সব বুঁদ হয়ে আছে। শেক্সপিয়ার ঠিকই বলেছেন, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। It's a tale told by an idiot... Out out brief candle.”^৭

কিংবা, যখন তিনি নয়নকে একেবারে স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করতেন, -

“হ্যাঁরে নয়ন সাগরদাঁড়িতে এখনও ফুলদোল, ঝুলন, রাস এসব হয়? একবার নিয়ে যাবি নয়ন আমাকে?”^৮

বলেই হঠাৎ একেবারে নতুন সুর যোগ করে দিতেন -

“শরতের ভোরে গোবর লেপা তপতপে উঠোন ভরে ভোরের বরা শিউলি ফুল
বোশেখ মাসের খাঁখাঁ দুপুরে বটতলা থেকে ভেসে আসা
রাখালিয়া বাঁশির সুর, রাতে দিঘিতে মাছ লাফানোর শব্দ...
মাঠে মাঠে ঝোপ ঝাড়ের সোঁদা গন্ধ, আষাঢ় মাসের
আকাশ ভরে নূতন মেঘের আনাগোনা
তারপর সারাটা দিন ঘরে বসে টাপুর টুপুর বৃষ্টি নূপুর—”^৫

বলে হঠাৎ সব সুর কেটে দিয়ে হাত পেতে চেয়ে নিচ্ছেন টাকা। লজ্জা নেই, শঙ্কা নেই। সমস্ত গৌরব জলাঞ্জলি দিয়ে নির্ধিকায় বলে উঠতেন, -

“ ‘তোর কাছে টাকা আছে?’ অর্থাৎ দৃশ্যের গোড়ায় মধুসূদন-জীবনের যে অভাব আর দারিদ্র্যের ছবি আঁকা হয়েছে তা যেন কিছুক্ষণ স্মৃতির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ক্ষতস্থান যেভাবে মাঝে মাঝে টন্ টন্ করে উঠে তার উপস্থিতি জানান দেয়, টাকা না থাকার সমস্যাটাও তেমন--সব সুর কেটে জেগে ওঠে। সেটাকেই যুক্তির মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করে দিতেন।”^৬

বিধায়কের যাত্রাপালা অনুযায়ী যখন মাইকেল ভার্সায়েতে আছেন। মনমোহন বসু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। তখন তাঁকে পেয়ে মাইকেল সৃষ্টির কথায় মশগুল। হঠাৎ বেল বেজে ওঠে আত্ননাদের মতো। এই সময় বিধায়কবাবু মাইকেলের কণ্ঠে যে সংলাপ বসিয়েছেন, তা এককথায় অনবদ্য। আরো অনবদ্য হবার কারণ স্বপনবাবুর অভিনয়কৌশল। এইসময় তিনি যেন গিমিকের শেষ কথা। হঠাৎ শরীরটাকে যতটা সম্ভব সংকুচিত করে ফেলতেন। এবং বলতেন, -

“ফর হুম দ্যাট বেল রিংস্? ওরা আমাকে জেলে দেবে। আমি জেলে যেতে পারব না।”^৭

বলতে বলতে তাঁর সংকুচিত শরীরটা কাঁপতে কাঁপতে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যেত মাইকেল। এবং তারপরই মনমোহন হেনরিয়েটাকে বলছেন, এ কী অবস্থা হয়েছে ওঁর! মাইকেলের জীবনের এই যে নানান ঘটনাগুলোকে সংলাপ ও অভিনয় দক্ষতার গুণে মুহূর্তের মধ্যে একমঞ্চে তুলে ধরার এই যে অভিনব কায়দা বা আবিষ্কার তা একমাত্র বিধায়ক ভট্টাচার্যের কলমেই সম্ভব। এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। অথচ কোনোটি অর্থহীন নয়।

গ্রামে মফস্বলে বিধায়ক ভট্টাচার্যের *মাইকেল মধুসূদন* বারবার অভিনীত হয়েছে। বারবার মানুষজন ছুটে গেছেন স্বপনকুমার-স্বপ্নাকুমারী-চপলকুমারের অভিনয় দেখার জন্য।

“ ‘মাইকেল মধুসূদন’ পালা প্রথম মঞ্চস্থ হয় অ্যালেন মার্কেটে। মানে সোনাগাছির কাছেই। রাতভর পালা দেখেন সমাজের প্রকৃত ব্রাত্যজনেরা। তারপর সেই তথাকথিত অশিক্ষিত বারবণিতারা দাবি করেন আঁচল পেতে দেবেন। স্বপনকুমারের পা রাস্তায় পড়তে দেবেন না। গ্রামের মানুষও তো বুঝেছিলেন। রসলাভ করেছিলেন। না হলে একটি পালা টানা চার বছর চলে কী করে? এবং দুবার রিমেক হয় কী করে? উৎপল দত্তের ঝড়-এ রাধাকান্ত দেব, নহুঁশ শর্মা এসব খল চরিত্র ছিল। তার সঙ্গে দ্বন্দ্বও ছিল। কিন্তু মাইকেল-এ কে ভিলেন? তিনি নিজেই নিজের ভিলেন। সংঘাত কার সঙ্গে কার? নিজের সঙ্গে নিজের। তখনকার মানুষ বুঝেছিলেন তো। সর্বশিক্ষা অভিযান হয়নি। শিক্ষার আলো ছড়ায়নি। সাক্ষরতা অভিযান হয়নি। অথচ ‘মাইকেল মধুসূদন’ দেখে তামাম গ্রাম বাংলার মানুষ মুগ্ধ তো হয়েছিলেন। এই ঘটনাই পথ করে দিল যাত্রায় উৎপল দত্ত থেকে শ্যামল ঘোষকে।”^৮

নটসম্রাট স্বপনকুমারের নাম তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকে বিধায়কবাবুও মঞ্চ সফল উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের শহর থেকে গ্রাম, বলা ভালো বঙ্গদেশে সর্বত্র তিনি রচয়িতা নাট্যকার ও পালাকার হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করে ফেলেছেন। মাইকেল মধুসূদন যাত্রাপালায় মঞ্চে বিধায়কবাবুকে প্রত্যক্ষভাবে কেউ পেলেন না ঠিকই, স্বপনকুমারকে তো পাওয়া গেল। তাঁর মতো বড়ো শিল্পী আছে কজন! এ বিষয়ে একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য -

“যাত্রা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত নট স্বপনকুমার, তিনি একাই একটি দল চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। ... বলতে পারি নবগঠিত 'স্বপন অপেরা' এবারে নতুন করে, যে বুকিং তার দলের হয়েছে এতো বেশী কোন দলের হয় নি। তিনি বর্তমানে সবচেয়ে বড় শিল্পী।”^৯

৫

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এত সাফল্যের পর এ পালা হঠাৎ বন্ধ হল কেন? না, হঠাৎ বন্ধ হয়নি। বরং যা ঘটেছিল- ১৯৮২-তে স্বপনকুমার যাত্রা থেকে সরে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন এবং বলেছিলেন -

“বিদায় নিলাম। এই বিদায় নেবার অনেকগুলো কারণ পরে খতিয়ে দেখেছি। প্রথমত স্বপ্নাকুমারীর মৃত্যু। সেটা ঘটেছিল ১৯৭৯-তে। তারপর দুটো একটা বছর অভিনয় করে তিনি তেমন আনন্দ পাচ্ছিলেন না। বলা বাহুল্য তাঁর এই শিষ্য তাঁর জীবনে সবচেয়ে পছন্দসই অভিনেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। অভিনয় যৌথশিল্প। সত্যিই আদান-প্রদানের বড়ো প্রয়োজন। মাইকেলের মা-এর চরিত্রে বীণা ঘোষের অভিনয় কিংবা দেবকী চরিত্রে জ্যোৎস্না দত্তের সেই গান 'কেন হেরেছিলেম তারে' এসব না হলে হয় না।”^{১০}

আসলে মাইকেল মধুসূদন একটি বিতর্কিত চরিত্র। এখানে কে ভিলেন আর কে নায়ক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। স্বপনকুমারের যাত্রার মধ্যদিয়ে মাইকেল মধুসূদন পৌঁছে গিয়েছিলেন শিক্ষিত-নিরক্ষর মানুষ ছাড়িয়ে বিস্তৃত পরিসরে এবং স্বপনকুমারও পৌঁছে গিয়েছিলেন খ্যাতির শিখরে। আর এই *মাইকেল মধুসূদন*-ই বিধায়ককে যাত্রাপালা রচয়িতার সুউচ্চ সম্মান এনে দেয়। যদিও মধুসূদন তারও আগে থিয়েটার, চলচ্চিত্রে অভিনেতাদের হাত ধরে নেমে পড়েছেন। তা-সত্ত্বেও বিধায়ক-মধুসূদন-স্বপনকুমার সর্বকালের সেরা জুটি। তা না হলে, এক মাইকেল মধুসূদন কেন এক একজন দর্শক দশ থেকে বারোবার দেখতেন তার উত্তর বুঝি এখানেই লুকিয়ে। এই যে স্বপনকুমারের বিচিত্র অভিনয়শৈলী, যার মধ্যে গভীরতাও যেমন গিমিকও তেমন, কিন্তু সে গিমিক অর্থহীন নয়। এ অভিনয় যাত্রায় তাঁর পরবর্তী কোনো অভিনেতার মধ্যে পাইনি। তিনি সে অর্থে দক্ষিণপন্থীও ছিলেন না। বামপন্থী তো ননই। আর এই না হওয়ার কারণে অনেক ইতিহাস রচয়িতা উৎপল দত্তের শিক্ষাধীন শেখর গঙ্গোপাধ্যায়কে স্বপনবাবুর চেয়ে উঁচুতে জায়গা দেন। শেখরবাবুও বড়ো মাপের অভিনেতা, কিন্তু স্বপনবাবুর মতো চর্চায়, চর্চায় আপন বৃত্ত রচনা করতে পারেননি। আর এখানেই বিধায়ক-মধুসূদন-স্বপনকুমার জুটির সার্থক জয় সূচিত হয়। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের রচয়িতা হিসেবে বিধায়কবাবুর আর একবার সাফল্যপ্রাপ্তি ঘটল। অর্থাৎ বঙ্গরঙ্গমঞ্চ বিধায়কবাবু ব্যতীত প্রায় শূন্যই বলা চলে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় সুরজিৎ, *যাত্রায় স্বপনকুমার*, থীমা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০১১, পৃ. ৯
২. *শারদীয় নতুন খবর ১৩৭৯*, পূজা স্পেশাল ১৯৭২, কলকাতা, পৃ. ২৩৯
৩. বন্দ্যোপাধ্যায় সুরজিৎ, *যাত্রায় স্বপনকুমার*, থীমা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০১১, পৃ. ৯-১০
৪. তদেব, পৃ. ১০
৫. তদেব, পৃ. ১০
৬. তদেব, পৃ. ১০
৭. তদেব, পৃ. ১১
৮. তদেব, পৃ. ১২
৯. *শারদীয় নতুন খবর ১৩৭৯*, পূজা স্পেশাল ১৯৭২, কলকাতা, পৃ. ২৩৮
১০. বন্দ্যোপাধ্যায় সুরজিৎ, *যাত্রায় স্বপনকুমার*, থীমা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০১১, পৃ. ১২

Bibliography:

গুপ্ত ক্ষেত্র (সম্পাদিত), *মধুসূদন রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫

ঘোষ শ্যামল, *স্মৃতি সত্তা নাট্য*, প্রথম প্রতিষ্করণ সংস্করণ : ২০১৩, জানুয়ারি ২০০৩
দাস প্রভাত কুমার, *বাংলার যাত্রা : সঙ্গ অনুষ্ক*, দি সী বুক এজেন্সি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০২২
বসু রবি, *সাতরঙ*, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশ ২০১২